ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1688- 1695
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.390

পরেশ মন্ডলের কবিতায় রঙ: বৈচিত্র্যের সন্ধানে

চৈতালি ঘোষ, গবেষক, *উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The use of Color in the poetry of Paresh Mandal, a significant poet of the 1960s in Bengali literature, constructs dimensions that are simultaneously aesthetic and psychological. Throughout his poetic oeuvre, Color does not remain confined to the visible spectrum but becomes a medium for expressing emotion, consciousness, and living experience. The present paper aims to explores this multidimensional approach of Color across the various poems of Paresh Mandal. By analyzing the application of Color at biological, psychological, and cultural levels, the paper demonstrates how the Poet portrays vitality and passion through red, pain and depth through blue, emptiness and loneliness through white, and optimism and life-force through green. Additionally, the shades of darkness, corruption, and social decay emerge through the Color black. Furthermore, this paper elucidates how Color serves as a powerful, symbolic language in Paresh Mandal's poetry, encapsulating the individual psyche, social consciousness, and the sense of time.

Keywords: Color, Diversity, Time-consciousness, Aesthetics, Paresh Mandal, Modern Poetry

বাংলা সাহিত্যে ছয়ের দশকের জনপ্রিয় কবি পরেশ মন্ডল। মূলত শ্রুতি আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসাবেই তিনি খ্যাতির আসন লাভ করেন; যুক্ত ছিলেন 'অব্যয়', 'ঈগল', 'মহাদিগন্ত', 'শাস্ত্রবিরোধী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকার সাথে। 'অদূরে জলের শব্দ', 'প্রতিবিম্ব', 'মানমন্দির', '৪৪৪', 'পেণ্ডুলাম', 'লোডশেডিং ১৯৮৩', 'হাত', 'শেষ এবং শুরু' 'নিজস্ব বলয়'- নামে প্রকাশিত তাঁর একাধিক কাব্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন একান্ত অনুভূতিনির্ভর রঙের রহস্যময় খেলা। পরেশের কবিতায় রঙ কেবল অনুভূতির সংক্রামক হিসাবে কাজ করেনি, কখনো পাঠকের সাথে, কখনো বা নিজের সাথে নিজের যোগাযোগ স্থাপনের উপায় হয়ে উঠেছে। ধীমান দাশগুপ্ত 'রঙ' গ্রন্থে রঙকে দুটি ভিন্ন তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন-

> রঙ বলতে আমরা দুটো ভিন্ন প্রতীতিকে বোঝাই, ১. মানুষের দৃশ্যানুভূতি বিশেষ কোনো আলো থেকে রঙের বিষয়ে যে অনুভব প্রাপ্ত হয় তা, ২. বস্তুর বিশেষ ধর্ম হিশেবে রঙ, যে ধর্মের ফলে বস্তুটির নির্দিষ্ট বর্ণের আলোককে প্রতিফলিত বা প্রেরণ করার প্রবণতা দেখা যায়।[১]

চোখে দেখার মধ্য দিয়ে আমরা যে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা লাভ করি, তার অনেকটা জুড়েই থাকে রঙের অস্তিত্ব। সেই রঙ দিয়েই পরিচয় ঘটে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানবপ্রকৃতির। গবেষক সহেলি চৌধুরী তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভে এ প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্যই করেছেন-

> "একটু গভীর ভাবে ভাবলে বুঝি রঙের অস্তিত্ব বা অনুভব সবটাই আসলে জীবন জারিত একটি একঘন বোধ। রঙের চেতনা আমাদের কাছে এমন এক সম্পূর্ণ অনুভূতি যা সহজ স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের মত জীবনকে আবহমান কাল ধরে ধারণ করে আসছে।"[২]

রঙের উপলব্ধির সাথে আমাদের চেতনা তথা প্রজ্ঞা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কবির ভাষায়- "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।"[৩] প্রতিটি রঙেরই একটা নিজস্ব আবেদন আছে, যা আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে। কবিরা অনেকক্ষেত্রে গূঢ় অনুভূতি, জটিল মানসিক সংবেদনগুলিকে কথার দ্বারা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে 'রঙ' হয়ে দাঁড়ায় উপযুক্ত মাধ্যম। কবি পরেশ মন্ডলও তাঁর অনেক কবিতায় ভাবপ্রকাশক হিসাবে বর্ণের ব্যবহার করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। রঙ সম্পর্কে ধীমান দাশগুপ্ত তাঁর 'রঙ' গ্রন্থের 'রঙ : বিজ্ঞানের কথা' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "বিজ্ঞান তিনটে পৃথক ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে রঙকে বিচার করে দেখে: পদার্থবিজ্ঞান, মনোপদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে রঙ হল বিকীর্ণ শক্তি। মনোপদার্থবিজ্ঞান অনুসারে রঙ হল ভৌত উদ্দীপকের প্রতি দর্শকের অক্ষিপটের প্রতিবেদন বা প্রতিক্রিয়া। মনোবিজ্ঞান অনুসারে রঙ হল এক ধরনের চাক্ষুষ সংবেদন, যার অস্তিত্ব শুধুমাত্র মনের অস্থায়ী সচেতনতা রূপে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রঙ সংক্রান্ত তৃতীয় দৃষ্টিকোণটিতেই আমরা মূলত অভ্যস্ত।"[৪]

মনস্তত্ত্ব অনুসারে দেখা যায় প্রতিটি রঙের সঙ্গে একাধিক মানসিক সংবেদনগুলির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অনেক সময় সেগুলি পরস্পর বিরোধী। পরিবেশ, প্রসঙ্গ অনুসারে রঙ অর্থ তৈরি করে, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় একই রঙ প্রসঙ্গ অনুসারে একাধিক ভাবকে প্রকাশ করছে। কবির মনোভাব অনুসারে তৈরি হচ্ছে রঙের ব্যঞ্জনা।[৫] পরেশ মন্ডলের কবিতা আলোচনার মধ্য দিয়ে রঙের সাথে মনস্তত্ত্বের সূচারু যোগসূত্রটিকেও খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। কোনো ব্যক্তিমানুষ তিনভাবে নিজেকে রঙের সাথে একাত্ম করতে পারে, যথা- জৈবিকভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। পরেশ মন্ডলের কবিতায় এই তিনটি দিক কীভাবে উঠে এসেছে তাও আমরা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করব। পরেশ মন্ডল 'নিলাজ নগ্নতা' কবিতায় বলছেন-

> আরক্তিম মুখখানা ছুঁয়েছিল মেঘ ঝড় জল,
> চোখে চোখে তৃষ্ণা কোনো অতীতের মৃত করবীর,
> যেহেতু ও-নায়িকার অভিমানটুকুই সম্বল
> এবং নিলাজ প্রেম হাসি নিয়ে পরিধিতে স্থির।[৬]

আরক্তিম মুখে অন্তরঙ্গ হতে চাওয়ার অভিব্যক্তি স্পষ্ট। একই সাথে তৃষ্ণার্ত চোখ স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের কোনো স্মৃতিসুধার কথা। জৈবিক অভিব্যক্তির প্রকাশক রূপে আরক্তিম মুখের উল্লেখ তাই যথাযথ হয়েছে। 'মুখোমুখি অন্ধকার' কবিতায় কবি সৌন্দর্য ও নিষ্ঠুরতাকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপন করেছেন-

> সর্বদাই জলাতংক সারাদিনটা শয্যাশায়ী
> অন্যপারে ঘূর্ণিবাতাস
> মরুভূমি মৃত্যুর নাম জ্যোৎস্না এবং রক্তের দাগ[৭]

মানব-অভিজ্ঞতার জটিল থেকে জটিলতর রহস্যের উন্মোচন করেছেন কবি তাঁর এই কবিতায়। মরণশীলতা ও ক্ষণস্থায়িত্বই এই কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। 'জ্যোৎস্না' ও 'রক্তের দাগ'—ছবি-দুটি পাশাপাশি রেখে অদ্ভূত এক রহস্যময় পরিবেশ কবি সৃষ্টি করেছেন। সৌন্দর্য ও নিষ্ঠুরতা, আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব এই দুই চিত্রের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। "লালের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে Ellen Conroy বলেন Red is the colour of the blood; hence it is not surprising that red is the colour denoting life and action, cheerfulness and enthusiasm. Red is used by healers as a powerful stimulant and tonic thus it has the meaning of health and vigour. একদিকে এটি খুব উষ্ণ রঙ যার শরীরে ও মনে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে...শক্তিচক্রের সঙ্গে এই রঙের প্রত্যক্ষ যোগ আছে বলে প্রেম-ভালোবাসা, যৌনতার মত ইতিবাচক আবেগকে যেমন তা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে অন্যদিকে তীব্র ঘৃণা, ভয়, প্রতিহিংসা প্রভৃতির মত ভাবগুলিকেও বহন করতে পারে"[৮] কবিতায় জৈব অভিব্যক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়ায় লাল রঙের অনুষঙ্গ যথাযথ হয়েছে। 'করুণা কে চায়' কবিতায় এসেছে নীল রঙের প্রসঙ্গ। হালকা নীল রঙ যেখানে সহনশীলতা, রোমান্টিসিজম, অসীমতা, জ্ঞানের প্রকাশ করে সেখানে গাঢ় নীল রঙ ভয়, অস্বস্তি, উদ্বেগ, হিংস্রতার প্রকাশক।[৯] পরেশ মন্ডল তাঁর কবিতায় বলছেন-

সবাই যাতনা দেয় অকৃপণ সাধে
গলায় পরাতে চায় মন্ত্রপূত বিষের মাদুলি,
কোনোকালে নীলকণ্ঠ ছিলাম না আমি
তাহলে কি ক'রে বলো দুটো হাতে একা একা এ-বন্ধন খুলি?[১০]

কবিতায় বিষজর্জর যন্ত্রণা বা কাতরতা সহ্য করার প্রসঙ্গে এসেছে পৌরাণিক দেবতা শিবের অনুষঙ্গ। সমুদ্রমন্থনে যে গরল উঠেছিল তা নিজকণ্ঠে ধারণ করে শিব হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। শিবের মতো বিষের জ্বালা সহ্য করার ক্ষমতা কথকের নেই। অথচ টিকে থাকার জন্য ঝুঝতে হবে সকল জখমের সাথে। 'কলকাতা ১৯৬৮' কবিতায় বিধ্বস্ত কোলকাতার নাগরিক যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে। কবি বলছেন-

ধুলোবালি নীল রোদে শরীর পুড়ে যাচ্ছে
চোখের নিচে দাগ
গলার স্বরে চিড়[১১]

'নীল রোদ' কবিতায় তীব্র জ্বালাবাহী অর্থে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'চোখের নিচে দাগ', 'গলার স্বরে চিড়' বিধ্বস্ত নাগরিক যাপনের ছবিটিকে তুলে ধরায় নীল রোদের ব্যঞ্জনা বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়েছে। 'গোপনীয়' কবিতায় নীল রঙ কামনা ও গোপনীয়তার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। গোপনীয়তার নিজেকে স্থায়ী করার প্রবণতা রয়েছে। লাল সাধারণত কামনা বা প্যাশানকে ইঙ্গিত করলেও এখানে নীল রঙের মধ্য দিয়ে সেই অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে-

অবশ্য পাঁচটি ফুলে—এবং ফুলের নীল জ্যোৎস্নার ভিতর
স্বেচ্ছাচার বেড়েছে কেবল।
গোপনে
নর্মদা যেন—গোপনীয়—আরো
গোপনীয় হতে চায়।[১২]

'..... এবং দশটি পাখি' কবিতায় এমন একটি দৃশ্যের উপস্থাপনা করা হয়েছে যেখানে দশটি পাখি প্রোজ্জ্বলিত নীল বাতিটার দিকে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কুয়াশা এসে পাখিদের 'নরম লাল ঠোঁট' স্পর্শ করায়

প্রোজ্জ্বলিত নীল শিখাটি পাখিদের কাছে গভীর ক্ষতের মতো দুর্বোধ্য ও রহস্যময় মনে হয়েছিল। কবিতাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যেখানে নীল আলোর দিকে ধাবিত পাখিদের মধ্য দিয়ে স্বাধীন আনন্দঘন অনুভূতি ব্যক্ত। অন্যদিকে কুয়াশার আগমন ও পাখিদের নরম লাল ঠোঁট স্পর্শ করা স্বাধীন নিস্তরঙ্গ জীবনে আকস্মিক বিশৃঙ্খল অনুপ্রবেশের মতো—যা তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে, বাধ্য করেছে জটিল আবর্তে মিশে যেতে-

হঠাৎ কুয়াশা এসে তাদের নরম লাল ঠোঁট
স্পর্শ করতে
বাতির শিখাটি এক গভীর ক্ষতের মতো দুর্বোধ্য ও
বিভীষিকাময় মনে হলো,
ডানার চঞ্চল শব্দে তরঙ্গ—তরঙ্গ
স্থির হতে হতে দূরে চোখের দৃষ্টির চেয়ে জটিল আবর্তে
মিশে গেল।[১৩]

পাখিদের 'নরম লাল ঠোঁট'-এর উল্লেখ জৈবিক অনুষঙ্গকেই দ্যোতিত করেছে। 'নিমগাছ নীল ছায়া' কবিতায় 'নীল ছায়া' মৃত্যুর পূর্বাভাস বহন করে-

বাড়িটা
পাশে
নিমগাছ
নীল ছায়া
শুয়ে আছে সেই মৃত নাবিকের মতো
তার
বরফের সাদা রক্তের ভেতরে[১৪]

'বরফের সাদা রক্ত' প্রাণহীনতার প্রতীক যেখানে মৃত্যু ও স্থবিরতার এক গাঢ় চিত্র ফুটে উঠেছে। 'প্রদর্শনী' কবিতায় কবি পাশাপাশি দুটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—একটি মরুভূমি, ঊষর প্রান্তরের ছবি। অন্যটি ক্লোরোফিলের গন্ধমাখা পার্কের বসন্তের ছবি। একটি অতীত সময়কে নির্দেশ করেছে, অন্যটি বর্তমান সময়কে। প্রকৃতির এই বিচিত্রতা—কোথাও ধূ ধূ মরুভূমি, কোথাও সবুজ অরণ্যানি। এক সময় কবির জীবনও প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিল। বসন্ত ছিল, ছিল মানুষের নিত্য আনাগোনা। কিন্তু আজ জীবন মরুভূমির বালির মতো তপ্ত, যেখানে একটা গাছের খুব প্রয়োজন—যে ছায়া দিয়ে আগলে রাখবে। সবুজ যৌবনের রঙ, আশার রঙ। এখানে সরাসরি সবুজ রঙের উল্লেখ না থাকলেও সবুজতার আভাস স্পষ্ট হয়েছে উদ্ধৃত ছত্রের মাধ্যমে- ক্লোরোফিলের গন্ধ পার্কের বসন্তে।[১৫]

'পড়ে রইল' কবিতা শুরু হয়েছে ডিসেম্বরের এক শীতের রাতের বর্ণনা দিয়ে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য নিয়ে যে মনুষ্য জীবনদশা তাকে কবিতায় পর্ণমোচী গাছের সাথে তুলনা করেছেন কবি। গাছ যেমন করে শীতে পাতা ঝরায়, পড়ে থাকে শুধু 'ফেরারী যৌবন'—তেমনি মানুষও একসময় যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্য হারায়। তখন পড়ে থাকে শুধুই যৌবন দিনের স্মৃতি। 'হলুদ চাঁদের আলো' ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের ইঙ্গিত দেয়। সামাজিকভাবে নাগরিকতা, প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, আনন্দ, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ভাবগুলির সঙ্গে হলুদের যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি মৃত্যু, বিবর্ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি জুড়ে আছে এর সঙ্গে। অন্যদিকে বিবর্ণ হলুদ আবার নেতিবাচক ভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। বিবর্ণ হলুদের সঙ্গে মৃত্যু, ভয়, প্রতারণা, অবিশ্বাস, অবসাদ, লোভ, প্রভৃতি ভাবগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা।[১৬] হলুদ চাঁদের

আলোর বিপরীতে 'সবুজ বসুন্ধরা'-র প্রতিস্থাপন বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে অবশ্যম্ভাবীভাবে। সময়ের সাথে সাথে যৌবনের প্রাণস্ফূর্ততা হারিয়ে প্রিয়জনদের হারানোর স্মৃতি-কাতরতা জড়িয়ে আছে কবিতার পরতে পরতে-

ডিসেম্বরে
কাঁপানো শীতের রাতে
সব পাতা ঝরে যায়
থাকে শুধু ফেরারী যৌবন
হলুদ চাঁদের আলো
কুমারী বাগানে[১৭]

'লোডশেডিং ১৯৮৩' কাব্যের অন্তর্গত 'ছাগলটা' কবিতাটি কবি লিখেছেন বাস্তবিক পরিস্থিতি অনুসরণ করে। ঈশপ যেমন তার চারপাশের মানুষজনের আচার-আচরণ দেখে বিভিন্ন পশুপাখির রূপকে, তাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তিগুলি তুলে ধরতেন, তেমনি কবিও এখানে কালো ছাগলটার রূপকে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন। আমাদের চারপাশে তাকালেও এমন কিছু মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, যারা আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। পেটে তাদের একফোঁটা বিদ্যাও নেই, কেবল ফাঁপা বুলি আওরে তারা সমাজে একটা জায়গা দখল করে নিয়েছে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করে চলেছে। কালো যেমন গোপনীয়তার রঙ তেমনি অবসাদ ও নিরাপত্তাহীনতার ভাবকে বহন করে। বিষণ্ণতা, উদ্বেগ প্রভৃতি নেতিবাচক চিন্তার বিকাশে কালো রঙের বিশেষ ভূমিকা আছে। শুধু তাই নয় মনস্তত্ত্ব অনুসারে কালো ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ আর পাপের রঙ।[১৮] কবিতায় উল্লিখিত 'কালো ছাগলটা'র প্রসঙ্গ তাই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ-

জিভ রসালো
ছাগলটা abcd জানে না
কেবল ভ্যা করতে পারে
ছাগলটা
কালো ছাগলটা[১৯]

'হঠাৎ' কবিতায় 'কালো ঘোড়া'-র দিগন্ত পেরিয়ে ছুটে আসার যে ইঙ্গিত কবি বর্ণনা করেছেন তা বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। কবিতায় বিশেষ করে সময়কাল লক্ষ্য করার মতো-

কালো ঘোড়া ছুটে আসে দিগন্ত পেরিয়ে
মাঘ মাস-এ
ঘাসে ঘাসে কুয়াশার লিপ্‌স্‌টিক্
আকাশে সূর্যের শেষ বিস্মরণ[২০]

দিগন্ত পেরিয়ে কালো ঘোড়ার ছুটে আসা পরিবর্তমান সময়কেই ইঙ্গিত করছে। শীতের আবহ, কুয়াশার আচ্ছাদন, সূর্যাস্তের অন্তিম রশ্মির বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দাঁতাল ক্ষুরের ফ্রেমে সবুজ চেতনার পিষে যাওয়া বন্ধ্যাত্ব, অনুৎপাদনশীলতাকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছে- 'খুরের দাঁতাল ফ্রেমে পিষে যায় চেতনা সবুজ[২১]। 'সিগন্যাল' কবিতায় কবি রাতের এক নিঃশব্দ, শিশিরভেজা দৃশ্যের অবতারণা করেছেন-

রাতজাগা সিগ্‌ন্যালের লাল চোখে
শীতের শিশির
রেললাইনটা শুয়েছিল[২২]

কবিতার নামকরণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 'লাল চোখে'-র ইঙ্গিত তাৎপর্যবাহী। 'লাল চোখ' বিপদ সংকেতের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু এই কবিতায় 'লাল চোখ' অন্য তাৎপর্যে উপনীত। সিগন্যালের লাল চোখ ট্রেনের আগমন বা প্রস্থানের বার্তা নিয়ে আসে। ট্রেনের আগমন, প্রস্থান কবিতায় সম্পর্ক, জীবন বা সুযোগের ক্ষণস্থায়িত্বকে সংকেতিত করেছে। কবিতার পরবর্তী অংশটি পড়লে এটা বুঝে নিতে পাঠকের অসুবিধা হয় না-

ট্রেন এল
চলে গেল
প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌-এ আমি
একা[২৩]

'সিগন্যাল'-কে একটি অন্তর্দশনের কবিতা বলা যেতে পারে যেখানে উদাসীন পৃথিবীর একলাযাপনে মানুষ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সংযোগের সন্ধান করে। সিগন্যাল সেই সংযোগের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে এবং 'লাল চোখ' সংযোগের ক্ষণস্থায়িত্বকে সূচিত করে। 'ট্রেন' কবিতায় 'লাল সংকেত' আবার মৃত্যুর অনুষঙ্গ বহন করেছে। ট্রেন আসলে জীবনের গতিপ্রবাহকেই ইঙ্গিত করেছে, জন্ম পেরিয়ে মৃত্যুর দিকে যার যাত্রা। রাতের বাঁশি বাজিয়ে ছুটে চলা—জীবন থেকে মৃত্যুর যাত্রাপথে ক্রমশ সঞ্চারমানতাকে বোঝানো হয়েছে। নিজেকে 'মূঢ় যাত্রী উপায়হীন' বলে কবিকথক নিয়তির কাছে নতিস্বীকার করেছেন। 'লাল সংকেত' এখানে বিপদের আভাস বহন করে যার অনিবার্য পরিণতি 'নিঃশব্দে ছুটে চলা' ট্রেনের গতি চিরতরে থামিয়ে দিতে পারে-

আমি এক মূঢ় যাত্রী উপায়হীন
চেয়ে আছি বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি শুনবো বলে
লাল সংকেতের আকাঙ্ক্ষায়
ট্রেনটা নিঃশব্দে ছুটে চলেছে[২৪]

'শুধু' কবিতায় সবুজ সিগ্‌ন্যাল সদর্থকতার ইঙ্গিত বহন করে। কথক তার প্রিয় মানুষের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করে বলেছেন-

তোমার সবুজ সিগ্‌ন্যাল পেলে
লাফিয়ে পাঁচিল পেরোতে পারি
...
দেখো
কেমন সহজে
ঘরের জন্যে ঘর ভেঙে ফেলি[২৫]

সবুজ সিগন্যাল আশার সঞ্চালন ঘটায়। জীবনে স্বতঃস্ফূর্ততা ও উচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসে। 'সবুজ সিগন্যাল' এখানে উদ্দামতার প্রতীক, যা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কর্মে ঝাপিয়ে পড়ার প্রেরণা যোগায়। 'সবুজ সিগন্যালের জোরে 'ঘরের জন্য ঘর' ভেঙে ফেলা যায়, 'স্বপ্নের জন্য স্বপ্ন' কিংবা 'ইতিহাস দলা পাকিয়ে' গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। নিজের সীমাবদ্ধতাকে সরিয়ে রেখে নতুন উদ্যমে কোনো কিছু শুরু করার প্রত্যাশা এখানে ব্যক্ত। 'নারকাণ্ডা ২২। ১০। ৭২' কবিতায় পাইন গাছের সবুজ শাদা হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের বিবর্ণতা সূচিত। যে প্রাণবন্ততা, সবুজতা এক সময় ছিল তা আর নেই; অপসৃত হয়েছে। এই পরিবর্তনশীলতাকে ভয় পান না কবি। তাই বলতে পারেন-

চারিদিকে পাহাড়ে বরফ পড়ছে

পাইনের সবুজ এখন শাদা
রাত বাড়ছে শীত বাড়ছে
তা হোক ভয় নেই[২৬]

'কেউ খুশি হবে জানলে' কবিতায় 'শ্বেত নিশান' যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত দেয়। জীবনযুদ্ধে চলার পথে 'আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই' বলে কবিকথক মনে করেছেন। গন্তব্য অগ্রগামী। স্পষ্ট উচ্চারণে কথক নিজের অবস্থান জানিয়ে দেন। তথাপি কথককে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করলে কথকের বক্তব্য-

আমি
পরাজিত হতেও রাজি
...
নতজানু হবো
এবং
শ্বেত নিশান ওড়াবো[২৭]

এখানেই কবির মহানুভবতা প্রকাশ পায়। অন্যের আত্মতুষ্টির জন্য 'নতজানু' হতেও তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। অহিংসার প্রতীক হিসাবে বা শান্তিস্থাপনের ইঙ্গিতার্থে 'শ্বেত নিশান'-এর অভিধাটি তাই যথাযথ। ধূসর হল এমন একটি রঙ যা সাদা ও কালোর মধ্যবর্তী। মনস্তত্ত্ব অনুসারে ধূসরতা একেবারেই বিচ্ছিন্নতা ও বিষণ্ণতার রঙ। এই রঙের সঙ্গে উদাসীনতা, হতাশা, বিষাদ, নির্বেদ, ক্লান্তি, ক্ষয়, যান্ত্রিকতা, একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এই ভাবগুলির যোগ আছে। মানসিক অবসাদে, দ্বন্দ্বে এই রঙের চেতনা মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[২৮] 'আরতির ধ্বনি' কবিতায় ধূসর রঙ জীবনের অনিশ্চয়তাকে ব্যক্ত করে। ধূসর রঙ খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, আবার খুব বেশি ম্লানও নয়। ধূসর রঙ যেন অনেকটা স্বপ্নের মতো যা আমাদের অবচেতন মনের প্রতিনিধিত্ব করে-

শুনতে পেলাম
আরতির ধ্বনি
যেন
স্বপ্নের মতো ধূসর[২৯]

আরতির ধ্বনি শুনে কথক ফিরে গিয়েছেন সুদূর অতীতে। 'আশ্বিনের মেঘ', 'নদীর প্রবাহ'—গতিময়তা ও প্রবাহমানতাকে সূচিত করেছে। 'একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে' নেমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়ার প্রবণতাই ব্যক্ত হয়।

প্রাচীন কালে পৃথিবীর সর্বত্রই রঙের ব্যবহারে যুক্তি ও সৌন্দর্য নয়, প্রতীকতা ও রহস্যময়তা ছিল মুখ্য বিবেচ্য।[৩০] পরেশ মন্ডলের কবিতাতেও রঙ বহুমাত্রিক প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, কালো— প্রতিটি রঙই একটি নির্দিষ্ট আবেগ, অভিজ্ঞতা বা দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। তাই বলা যায়, পরেশের কবিতায় রঙ হয়ে উঠেছে গভীর অনুভূতি ও সময়চেতনার এক শক্তিশালী নান্দনিক ও দার্শনিক ভাষা।

তথ্যসূত্র:

১. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১৬।
২. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শ্যামলী। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫২, কলিকাতা, পৃ. ১৬।
৪. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২৩।
৫. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৩।
৬. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১৮।
৭. তদেব, পৃ. ৩৪।
৮. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৮।
৯. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা পৃ. ৪১।
১০. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৩।
১১. তদেব, পৃ. ৪৬।
১২. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৩. তদেব, পৃ. ৩১।
১৪. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৬১।
১৬. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১০-১১।
১৭. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৩।
১৮. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১০-১১।
১৯. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৩।
২০. তদেব, পৃ. ৯৭।
২১. তদেব।
২২. তদেব, পৃ. ১০১।
২৩. তদেব।
২৪. তদেব, পৃ. ৮৭।
২৫. তদেব, পৃ. ৭৯।
২৬. তদেব, পৃ. ৭৮।
২৭. তদেব।
২৮. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ২০।
২৯. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৪৩।
৩০. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩৬।